।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ ।।

।। অথ নবমোঽধ্যায়ঃ ।।

ষষ্ঠ অধ্যায়পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগের ক্রমিক বিশ্লেষণ করেছেন। যার শুদ্ধ অর্থ ছিল, যজ্ঞের প্রক্রিয়া। যজ্ঞে সেই আরাধনার বিধি-বিশেষের বর্ণনা আছে, যাতে চরাচর জগৎ আহুতি-সামগ্রী রূপে বিদ্যমান। মনের নিরুদ্ধ অবস্থাতে এবং নিরুদ্ধ মনেরও বিলয়কালে সেই অমৃত তত্ত্বকে জানা যায়। সাধনের শেষে যজ্ঞের পরিণাম অমৃতপান করে জ্ঞানী সনাতন ব্রহ্মে স্থিত হয়ে যান। ব্রহ্মে স্থিত অর্থাৎ মিলনের নামই যোগ। সেই যজ্ঞকে কার্যরূপ দেওয়াকেই কর্ম বলে। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, যিনি এই কর্ম করেন, তিনি ব্যাপ্ত ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ কর্ম, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ সহ আমাকে জানেন। অষ্টম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, পরমগতি একেই বলে, এই হল পরমধাম।

প্রস্তুত অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, যোগযুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য কিরূপ? সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত থেকেও তিনি কিভাবে নির্লিপ্ত? কর্ম করেও কিরূপে তিনি অকর্তা? সেই পুরুষের স্বভাব এবং প্রভাবের উপর আলোকপাত, যোগকে আচরণে পরিণত করবার পথে দেবতাদিক বাধা-বিঘ্ন থেকে সতর্ক করলেন এবং সেই পুরুষের শরণে যাবার জন্য জোর দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১।।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন- অর্জুন! অসূয়া (ঈর্ষা, দ্বেষ) মুক্ত তোমার জন্য আমি এই অতি গোপনীয় জ্ঞানকে বিজ্ঞানসহিত বলব অর্থাৎ প্রাপ্তির পরে মহাপুরুষের অবস্থিতি সম্পর্কে বলব যে, কিরূপে সেই মহাপুরুষ সর্বত্র একসঙ্গে কর্ম করেন,

কিরূপে জাগৃতি প্রদান করেন, কিরূপে রথী হয়ে সর্বদা আত্মার সঙ্গে থাকেন? **'যৎ জ্ঞাত্বা'**- যা' সাক্ষাৎ জানার পর তুমি দুঃখরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সেই জ্ঞান কিরূপ? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।। ২।।

বিজ্ঞানসংযুক্ত এই জ্ঞান সর্ববিদ্যার রাজা। বিদ্যার অর্থ ভাষা-জ্ঞান অথবা শিক্ষা নয়। **'বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদায়া।', 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।'** বিদ্যা তাকে বলে যা লাভ করে পুরুষ ব্রহ্মপথে চলে মোক্ষলাভ করেন। যদি পথ মধ্যে সিদ্ধাই অথবা প্রকৃতিতে কোথাও আবদ্ধ হন, তাহলে প্রমাণিত হয় যে, অবিদ্যা সফল হয়ে গেছে। সেটা বিদ্যা নয়। এই রাজবিদ্যা নিশ্চিত কল্যাণ করে। এই রাজবিদ্যা সমস্ত গোপনীয়ের রাজা। অবিদ্যা এবং বিদ্যার অবগুন্ঠন অনাবরণ ও যোগযুক্ত হলেই এর সঙ্গে মিলন হয়। এই বিদ্যা অতি পবিত্র, উত্তম এবং প্রত্যক্ষ ফলযুক্ত। এদিকে করলেই, ওদিকে ফল লাভ হয়– এইরূপ প্রত্যক্ষ ফলযুক্ত। এটা অন্ধবিশ্বাস নয় যে, এই জন্মের সাধনার ফল অন্য জন্মে লাভ হবে। এটা পরমধর্ম পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত। বিজ্ঞানসম্মত এই জ্ঞানলাভ করা সরল এবং অবিনাশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- অর্জুন! এই যোগপথে বীজের নাশ হয় না। এর অল্প সাধনও জন্ম-মৃত্যুর মহাভয় থেতে উদ্ধার করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ভগবন্! শিথিল প্রযত্নশীল সাধক নষ্ট-ভ্রষ্ট তো হয়ে যান না? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন! প্রথমে তো কর্ম কি, তা বোঝা আবশ্যক এবং বুঝবার পরে যৎসামান্য সাধন করে থাকলেও তা কোন জন্মে, কখনও বিনাশ হয় না; বরং ঐ যৎসামান্য অভ্যাসের প্রভাবে প্রত্যেক জন্মে তারই আচরণ করেন এবং অনেক জন্মের সাধনার পরিণামস্বরূপ, সেখানেই পৌঁছে যান, যার নাম পরমগতি অর্থাৎ পরমাত্মা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই সাধনার সম্বন্ধেই এখানেও বলছেন যে, এই সাধন করা খুব সহজ এবং অবিনাশী, পরন্তু এর জন্য শ্রদ্ধা নিতান্ত আবশ্যক।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।। ৩।।

পরন্তপ অর্জুন ! এই ধর্মে (যার যৎসামান্য সাধন করে থাকলেও তার বিনাশ হয় না) শ্রদ্ধারহিত পুরুষ (এক ইষ্টে মনকে কেন্দ্রিত করেন না যিনি) তিনি আমাকে লাভ না করে সংসারেই বিচরণ করেন। অতএব শ্রদ্ধা অনিবার্য। আপনি কি সংসার থেকে আলাদা ? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।। ৪।।

অব্যক্ত স্বরূপ আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ আমি যে স্বরূপে স্থিত, তা'সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সমস্ত প্রাণী আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি তাদের মধ্যে স্থিত নই; কারণ আমি অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত। মহাপুরুষ যে অব্যক্ত স্বরূপে স্থিত, সেই স্তর থেকেই (দেহ নই সেই অব্যক্ত স্তর থেকেই) বার্ত্তা করেন। এই ক্রমেই আরও বলছেন–

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।। ৫।।

বস্তুতঃ সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত নয়; কারণ তারা মরণধর্মা, প্রকৃতির আশ্রিত; কিন্তু আমার যোগমায়ার ঐশ্বর্য দর্শন কর যে, আমার আত্মা ভূতগণে অবস্থিত না হয়েও তাদের পোষক এবং উৎপাদক। আমি আত্মস্বরূপ সেইজন্য আমি ঐ ভূতগণে অবস্থিত নই। এই হ'ল যোগের প্রভাব। এটা স্পষ্ট করবার জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত দিলেন–

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।। ৬।।

যেমন আকাশে উৎপন্ন মহাবায়ু যেরূপ আকাশে সদৈব অবস্থান করেও আকাশকে মলিন করতে পারে না, সেইরূপ ভূতসকল আমাতে স্থিত, এরূপ জানবে। আমি আকাশবৎ নির্লিপ্ত, তারা আমাকে মলিন করতে পারে না। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ হ'ল। এইরূপ হয় যোগের প্রভাব। এখন প্রশ্ন– যোগী করেন কি? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।৭।।

অর্জুন! কল্পের বিলয়কালে সকলভূত আমার প্রকৃতি অর্থাৎ আমার স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং কল্পাদিতে আমি তাদের পুনঃ পুনঃ **'বিসৃজামি'**- বিশেষরূপে সৃষ্টি করি। তারা আগে বিকৃত অবস্থাতে ছিল, তাদেরই রচনা করি, সুসজ্জিত করি। যারা অচেতন, তাদের চেতনা প্রদান করি, কল্পের জন্য প্রেরণ করি। কল্পের তাৎপর্য উত্থানোন্মুখ পরিবর্তন। আসুরী সম্পদ্ ত্যাগ করে পুরুষ যেমন যেমন দেবী সম্পদের অধিকারী হন, তেমন তেমন কল্পের আরম্ভ হয় এবং যখন ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন, তখনই কল্পের শেষ হয়। নিজের কর্ম সম্পূর্ণ করে কল্পও বিলীন হয়ে যায়। ভজনের আরম্ভ কল্পের আদি এবং যেখানে লক্ষ্য স্পষ্ট হয় সেটাই ভজনের পরাকাষ্ঠা, কল্পের শেষ সেখানেই। যখন প্রত্যগাত্মা যোনির কারণভূত রাগ-দ্বেষাদি থেকে মুক্ত হয়ে নিজ শাশ্বত স্বরূপে স্থির হয়ে যায়, এই অবস্থা সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, তারা আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যে মহাপুরুষ প্রকৃতিকে বিলীন করে স্বরূপে স্থিত হন, তাঁর আবার প্রকৃতি কি? তাঁর মধ্যে কি প্রকৃতি এখনও বাকী? না, তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত প্রাণী নিজ প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। তাঁদের উপর প্রকৃতির গুণের যেরূপ প্রভাব থাকে, সেইরূপ তাঁরা কার্য করেন। এবং **'জ্ঞানবানপি'**- প্রত্যক্ষ দর্শনের পরে জ্ঞানীও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন। তিনি অনুগামীদের কল্যাণের জন্য করেন। পূর্ণজ্ঞানী তত্ত্বস্থিত মহাপুরুষের অবস্থিতিই তাঁর প্রকৃতি। তিনি স্ব স্বভাব মতই প্রবৃত্ত থাকেন। কল্পের শেষে মানুষ মহাপুরুষের এই অবস্থিতি প্রাপ্ত হন। মহাপুরুষের এই কৃতিত্বের উপর পুনরায় আলোকপাত করছেন—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।৮।।

স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ মহাপুরুষের অবস্থিতি স্বীকার করে **'প্রকৃতের্বশাৎ'**- নিজ নিজ স্বভাবে স্থিত প্রকৃতির গুণগুলির বশীভূত এই সমস্ত ভূতসমুদায়কে আমি পুনঃ পুনঃ **'বিসৃজামি'**-বিশেষরূপে সৃষ্টি, সুসজ্জিত করি। স্বীয় স্বরূপের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তাদের প্রেরণা প্রদান করি। তাহলে তো আপনি এই কর্মদ্বারা আবদ্ধ?

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু।। ৯।।

চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে– মহাপুরুষের কার্য-প্রণালী অলৌকিক হয়। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন যে-আমি অব্যক্তরূপে কর্ম করি। এখানেও বলছেন– ধনঞ্জয়! আমি যে সমস্ত কর্ম অব্যক্তরূপে করি, সেগুলিতে আমার আসক্তি নেই। উদাসীন পুরুষের ন্যায় অবস্থিত বলে পরমাত্ম-স্বরূপ আমাকে সেইসকল কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না; কারণ কর্মের পরিণামে যে লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয়, তাতে আমি অবস্থিত, সেইজন্য সেই সমস্ত কর্ম করার জন্য আমি বাধ্য নই।

এই প্রশ্ন ছিল স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃতির কার্যগুলির, মহাপুরুষের অবস্থিতি ছিল, তাঁর রচনা ছিল। এখন আমার অধ্যক্ষতায় মায়া যা' সৃষ্টি করে, তা' কি? তা'ও একটা কল্প–

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।। ১০।।

অর্জুন! আমার অধ্যক্ষতা দ্বারা অর্থাৎ আমার উপস্থিতিতে সর্বত্র ব্যাপ্ত আমার অধ্যাসদ্বারা এই মায়া (ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, অষ্টধা মূল প্রকৃতি এবং চেতন উভয়ই) চরাচর সহিত জগৎকে রচনা করে, যা' ক্ষুদ্র কল্প, এবং এই কারণেই এই জগৎ আবাগমনের চক্রে ঘূরতে থাকে। প্রকৃতির এইটা ক্ষুদ্র কল্প যার মধ্যে কালের পরিবর্তন হতে থাকে, আমার অধ্যাসায় প্রকৃতিই করে, আমি করি না; কিন্তু সপ্তম শ্লোকের কল্প আরাধনার সঞ্চার এবং সাধনা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মার্গদর্শনযুক্ত কল্প মহাপুরুষ স্বয়ং করে থাকেন। এক স্থানে তিনি স্বয়ং কর্তা, যেখানে বিশেষরূপে সৃজন করেন। এখানে কর্ত্রী প্রকৃতি, যে কেবল আমার অধ্যাস পেয়েই এই ক্ষণিক পরিবর্তন করে, যার মধ্যে দেহ-পরিবর্তন, কাল-পরিবর্তন এবং যুগের পরিবর্তন ইত্যাদিগুলি আছে। এইরূপ ব্যাপ্ত প্রভাব হওয়া সত্ত্বেও মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে জানতে পারে না। যেমন–

অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।। ১১।।

সমস্ত ভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমার পরমভাব সম্বন্ধে যারা জানে না সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে মনুষ্য দেহধারী এবং তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করে। সমস্ত প্রাণীগণের ঈশ্বরেরও যিনি মহান্ ঈশ্বর, সেই পরমভাব-এ আমি অবস্থিত; কিন্তু মনুষ্য দেহ আশ্রয় করে ব্যবহার করি বলে মূঢ়ব্যক্তিগণ জানে না। তারা আমাকে মানুষ বলে সম্বোধন করে। তাদেরই বা কি দোষ? দৃষ্টিপাত করে যখন, তখন মহাপুরুষের দেহটাই তো দেখতে পায়। আপনি মহান্ ঈশ্বরভাব-এ স্থিত, কিরূপে তারা বুঝবে? কেন তারা দর্শনে অসমর্থ হয়? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।। ১২।।

তারা বৃথা আশা (যা' কখনও পূর্ণ হবে না এইরূপ আশা), বৃথা কর্ম (বন্ধনকারী কর্ম), বৃথা জ্ঞান (যা বস্তুতঃ অজ্ঞান), '**বিচেতসঃ**'- বিশেষরূপে অচেতন, রাক্ষস এবং অসুরের ন্যায় মোহপ্রাপ্ত হয়, এইরূপ স্বভাব ধারণ করে থাকে অর্থাৎ আসুরী স্বভাবযুক্ত হয়, সেইজন্য মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। অসুর এবং রাক্ষসভাব মনেরই স্বভাব, জাতিপ্রসূত বা যোনিপ্রসূত নয়। যাদের আসুরী স্বভাব তারা আমাকে জানতে পারে না; কিন্তু মহাত্মাগণ আমাকে জানেন এবং ভজনা করেন–

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। ১৩।।

পরন্তু হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ দৈবী সম্পদ্ আশ্রয় করে মহাত্মাগণ আমাকে সর্বভূতের আদিকারণ, অব্যক্ত এবং অক্ষর জেনে অনন্যমনে অর্থাৎ মনের অন্তরালে অন্য কাউকে স্থান না দিয়ে কেবল আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে নিরন্তর আমাকে ভজনা করেন। কিরূপে ভজনা করেন? এই প্রসঙ্গে বলছেন–

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। ১৪।।

তারা নিরন্তর চিন্তনের ব্রতে দৃঢ় থেকে আমার গুণের স্মরণ করেন, প্রাপ্তির জন্য যত্নশীল হন এবং পুনঃ পুনঃ আমাকে নমস্কার করে সদা সমাহিত হয়ে অনন্য ভক্তিদ্বারা আমার উপাসনা করেন। অবিরল নিযুক্ত থাকেন। কি উপাসনা করেন?

এই কীর্তিগান কিরূপ? অন্য কোন উপাসনা নয় বরং সেই 'যজ্ঞ' যা' বিস্তারপূর্বক বলেছেন। সেই আরাধনা সম্বন্ধেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে সংক্ষেপে পুনরায় বলছেন–

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।। ১৫।।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ সর্বব্যাপ্ত বিরাট পরমাত্মারূপ আমাকে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা যজন করেন অর্থাৎ নিজের লাভ-লোকসান এবং সামর্থ্য বুঝে এই নিয়ত কর্ম যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। কেউ কেউ একত্বভাবে আমার উপাসনা করেন যে, তাঁকে, সেই পরমাত্ম-তত্ত্বে একীভূত হতে হবে এবং কেউ সমস্ত কিছু আমাকে পৃথক রেখে, আমাকে সমর্পণ করে নিষ্কাম সেবা-ভাব দ্বারা আমার উপাসনা করেন এবং নানাভাবে উপাসনা করেন; কারণ এ সকলই একটা যজ্ঞের উঁচু-নীচু স্তর মাত্র। সেবা থেকেই যজ্ঞ আরম্ভ হয়; কিন্তু এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় কিরূপে? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- যজ্ঞ করি আমি। যদি মহাপুরুষ রথী না হন, তাহলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। তাঁর নির্দেশ পেয়েই সাধক বুঝতে সক্ষম হন যে, কোন স্তরে তিনি এখন, কতদূর এগিয়েছেন? বস্তুতঃ যজ্ঞকর্তা কে? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।।১৬।।

আমিই কর্তা। বস্তুতঃ কর্তাকে প্রেরকরূপে সঞ্চালন করেন ইষ্ট। কর্তার দ্বারা যেটুকু সম্ভব হয়, তা' আমার কৃপা। আমিই যজ্ঞ। যজ্ঞ আরাধনার বিধি-বিশেষ মাত্র। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার পর পরিণামস্বরূপ যে অমৃত প্রাপ্ত হয়, তা' পান করে পুরুষ সনাতন ব্রহ্মকে জানতে পারেন। আমিই স্বধা অর্থাৎ অতীতের অনন্ত সংস্কার বিলীন করা, তাদের তৃপ্ত করতে সক্ষম হওয়া, সেটা আমারই কৃপা। আমিই ভবরোগ দূর করবার ঔষধি। আমাকে লাভ করার পর মনুষ্যগণ এই রোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমিই মন্ত্র। সাধক আমারই কৃপাতে মনকে শ্বাসের অন্তরালে নিরুদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এই নিরোধ ক্রিয়াতে যে 'আজ্য' (হবি) বস্তু তীব্রতা আনে, তা' আমি। আমারই প্রকাশে মনের সমস্ত প্রবৃত্তি বিলীন হয় এবং আহুতি অর্থাৎ সমর্পণও আমি।

এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বার বার 'আমিই' এই কথা বলছেন। এর তাৎপর্য এই যে, আমিই প্রেরকরূপে আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে এবং নিরন্তর নির্ণয় করে যোগক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করি। একেই বিজ্ঞান বলে। 'পূজ্য মহারাজজী' বলতেন যে– "যতক্ষণপর্যন্ত ইষ্টদেব রথী হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের) গতি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু না করে দেন, ততক্ষণপর্যন্ত ভজন আরম্ভই হয় না।" কেউ হাজার চোখ বুজে ভজন করুক, দেহ কৃশ করুক কিন্তু যতক্ষণ সেই পরমাত্মা, যাঁকে লাভ করতে ইচ্ছুক আমরা, যে স্তরে আমরা দাঁড়িয়ে, সেই স্তর থেকে, আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে জাগ্রত না হন, ততক্ষণ ঠিকভাবে ভজনের স্বরূপ বোঝা যায় না। সেইজন্য মহারাজজী বলতেন– "আমার স্বরূপ ধারণ কর, আমি সব দেব।" শ্রীকৃষ্ণ বলছেন– সবকিছু আমিই প্রদান করি।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সাম যজুরেব চ।।১৭।।

অর্জুন! আমিই সম্পূর্ণ জগতের '**ধাতা**' অর্থাৎ ধারণকর্তা, '**পিতা**' অর্থাৎ পালনকর্তা, '**মাতা**' অর্থাৎ জন্মদাত্রী, '**পিতামহঃ**' অর্থাৎ মূল উদ্‌গম, যাতে সকলেই লীন হয়ে যায় এবং জানবার যোগ্য পবিত্র ওঁকার অর্থাৎ '**অহম্ আকার ইতি ওঁকারঃ**' সেই পরমাত্মা আমার স্বরূপে স্থিত। 'সোহহং', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি একে অন্যের পর্যায়, এইরূপ জানবার যোগ্য স্বরূপ আমিই। '**ঋক্**' অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রার্থনা, '**সাম**' অর্থাৎ সমত্ব প্রদানকারী প্রক্রিয়া, '**যজুঃ**' অর্থাৎ যজ্ঞের বিধি-বিশেষও আমিই। যোগ অনুষ্ঠানের উপর্যুক্ত তিনটি আবশ্যক অঙ্গ আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।। ১৮।।

হে অর্জুন! '**গতিঃ**' অর্থাৎ লাভের যোগ্য পরমগতি, '**ভর্ত্তা**'-ভরণ-পোষণকারী, সকলের স্বামী, '**সাক্ষী**' অর্থাৎ দ্রষ্টারূপে স্থিত সকলের জ্ঞাতা, সকলের বাসস্থান, শরণগ্রহণের যোগ্য, অকারণ সুহৃদ্, উৎপত্তি এবং প্রলয় অর্থাৎ শুভ-অশুভ সংস্কার সমূহের বিলয় এবং অবিনাশী কারণ আমি। অর্থাৎ শেষে যার মধ্যে বিলীন হয়, সেই সমস্ত বিভূতি আমিই।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।। ১৯।।

সূর্যরূপে আমি উত্তাপ বিকিরণ করি, বর্ষা আকর্ষণ করি। মৃত্যুর অতীত যে অমৃততত্ত্ব এবং মৃত্যু, সৎ ও অসৎ সব আমি। অর্থাৎ যে পরমপ্রকাশ প্রদান করে, সেই সূর্যও আমি। যাঁরা ভজনা করেন, কখন-কখনও তাঁরা আমাকে অসৎ বলে মনে করেন, তাঁদের মৃত্যু হয়। এইরূপ বলছেন–

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-

মশ্নন্তি দিব্যান্দিবি দেবভোগান্।। ২০।।

আরাধনা বিদ্যার অঙ্গ তিনটি– ঋক্, সাম এবং যজু অর্থাৎ প্রার্থনা, সমত্বের প্রক্রিয়া এবং যজনের আচরণ করেন যাঁরা, সোম অর্থাৎ চন্দ্রমার ক্ষীণ প্রকাশ যাঁরা পেয়ে থাকেন, পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র পুরুষ সেই যজ্ঞের নির্ধারিত প্রক্রিয়ার আচরণ করেন, আমাকে ইষ্টরূপে পূজা করেন, স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। একেই অসৎ কামনা বলে, এতে তাঁদের মৃত্যু ঘটে, তাঁদের পুনর্জন্ম হয়, যেরূপ এর আগের শ্লোকটিতে যোগেশ্বর বলেছেন। তাঁরা আমারই পূজা করেন, সেই নির্ধারিত বিধি দ্বারাই করেন, কিন্তু পরিবর্তে স্বর্গ-কামনা করেন। সেই পুরুষগণ পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করেন, স্বর্গে অসাধারণ দেবভোগ উপভোগ করেন; অর্থাৎ আমিই সেই ভোগ প্রদান করি।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে।। ২১।।

তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মৃত্যুলোক অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বিবর্তিত হন। এইরূপ **'ত্রয়ীধর্মম্'**- প্রার্থনা, সমত্ব এবং যজনের

তিনটি বিধিদ্বারা একটা যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন যাঁরা, তাঁরা আমার শরণাগত হলেও সকাম হওয়ার জন্য পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের মূল কখনও নাশ হয় না, কারণ এই পথে বীজের নাশ হয় না। কিন্তু যাঁরা কোনরূপ কামনা করেন না, তাঁরা কি লাভ করেন?–

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। ২২।।

অনন্যভাব-এ আমাতে স্থিত ভক্তগণ পরমাত্মস্বরূপ আমারই নিরন্তর চিন্তন করেন, **'পর্যুপাসতে'**-লেশমাত্রও ত্রুটি না রেখে আমার উপাসনা করেন, সেই নিত্য একীভাবে সংযুক্ত পুরুষগণের যোগক্ষেম স্বয়ং আমি বহন করি অর্থাৎ তাঁদের যোগের সুরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিই। এর পরেও লোকে অন্যান্য দেবতাগণের ভজনা করে–

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।। ২৩।।

কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যে ভক্তগণ অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরা আমারই পূজা করেন; কারণ সেস্থানে কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তাঁদের এই পূজা বিধিসম্মত নয়, আমাকে লাভ করার বিধি থেকে এটা পৃথক্।

এখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয়বার দেবতাগণের প্রকরণ তুলেছেন। সর্বপ্রথম সপ্তম অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক থেকে ২৩শ শ্লোকপর্যন্ত তিনি বলেছেন যে, অর্জুন! কামনাদ্বারা যাদের জ্ঞান অভিভূত হয়েছে, এইরূপ মূঢ়ব্যক্তি অন্যান্য দেবতার পূজা করেন এবং যে দেবতাকে পূজা করেন, সেখানে দেবতা বলে কোন সক্ষম সত্তার অস্তিত্বই তো নেই। পরন্তু অশ্বত্থ, প্রস্তর, ভূত, ভবানী অথবা অন্যত্র যে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, সেখানে কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই। সর্বত্র আমিই। সেই স্থানেও আমি দাঁড়িয়ে তাঁদের দেবশ্রদ্ধা সেই-সেই দেবতাতে স্থির করি। ফলেরও বিধান আমি করি, ফল প্রদান করি। ফললাভও হয়; কিন্তু সেই ফল নষ্ট হয়ে যায়। আজ আছে তা কাল ভোগ করে নষ্ট হয়ে যাবে; পরন্তু আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। অতএব সেই মূঢ়গণ, যাদের জ্ঞান অভিভূত হয়েছে, তারা অন্যান্য দেবতার ভজনা করে।

প্রস্তুত অধ্যায়ের ২৩ থেকে ২৫শে শ্লোকপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলছেন যে, অর্জুন! যাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরা আমারই পূজা করেন; কিন্তু তা' বিধিসম্মত নয়। সেখানে দেবতার সক্ষম সত্তা নেই। তাদের প্রাপ্তির বিধি দোষপূর্ণ। এখন প্রশ্ন উঠছে যে, যখন তাঁরাও প্রকারান্তরে আপনারই পূজা করেন এবং ফললাভও করেন, তখন তা'তে ক্ষতি কি?

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাশ্চ্যবন্তি তে।। ২৪।।

সকল যজ্ঞের ভোক্তা অর্থাৎ যজ্ঞ যার মধ্যে বিলীন হয়, যজ্ঞের পরিণামে যা' লাভ হয় তা' আমি এবং আমিই প্রভু; পরন্তু তাঁরা আমাকে তত্ত্বতঃ উত্তমরূপে জানেন না, সেইজন্য '**চ্যবন্তি**'-স্খলিত হন। অর্থাৎ তাঁরা কখনও অন্যান্য দেবতাতে পতিত হন এবং তত্ত্বতঃ যতক্ষণ না জানেন ততক্ষণ কামনা দ্বারাও পতিত হন। তাঁদের গতি কি?–

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্।। ২৫।।

অর্জুন! দেবোপাসকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন। দেবগণ পরিবর্তিত সত্তা। তাঁরা নিজের সদ্‌কর্মানুসারে জীবন অতিবাহিত করেন। পিতৃগণের পূজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অতীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন। ভূতোপাসকগণ ভূত হন অর্থাৎ দেহধারণ করেন এবং আমার ভক্ত আমাকেই লাভ করেন। তাঁরা সাক্ষাৎ আমার স্বরূপ হন। তাঁদের পতন হয় না। এটুকুই নয়, আমার পূজার বিধিও সরল–

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।। ২৬।।

এখান থেকেই ভক্তি আরম্ভ হয় যে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করেন, মন থেকে প্রযত্নশীল সেই ভক্তের ঐসব সামগ্রী আমি গ্রহণ করি। সেইজন্য-

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।। ২৭।।

অর্জুন! তুমি যে কর্মের (যথার্থ কর্মের) আচরণ কর, যা' আহার কর, যা' হোম কর, দান কর এবং মনসহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে আমার অনুরূপ তৈয়ার কর, সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করবে অর্থাৎ আমার প্রতি সমর্পিত হয়ে এই সমস্ত কর। সমর্পণ করলে আমি যোগক্ষেত্রের দায়িত্ব বহন করব।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।। ২৮।।

এইরূপে সর্বস্বের ন্যাস সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হয়ে তুমি শুভাশুভ ফল বিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে লাভ করবে।

উপর্যুক্ত তিনটি শ্লোকেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ক্রমবদ্ধভাবে সাধন এবং তার পরিণামের বর্ণনা করেছেন। প্রথমে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল পূর্ণশ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পণ, দ্বিতীয় সমর্পিত হয়ে কর্মের আচরণ এবং তৃতীয় পূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে সর্বস্বের ত্যাগ। এ সকলদ্বারা কর্মবন্ধন থেকে বিমুক্ত (বিশেষরূপে মুক্ত) হয়ে যাবে। মুক্ত হলে লাভ কি? বলছেন আমাকে লাভ করবে। এখানে মুক্তি এবং প্রাপ্তি একে অন্যের পূরক। আপনার প্রাপ্তিই হ'ল মুক্তি, তাহলে তাতে লাভ? এই প্রসঙ্গে বলছেন—

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।। ২৯।।

সর্বভূতের প্রতি আমার একই ভাব। সৃষ্টিতে আমার প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কেউ নেই; কিন্তু যিনি অনন্য ভক্ত, তিনি আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁর হৃদয়ে বাস করি। এই আমার একমাত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আমাতে ও তাতে কোন পার্থক্য থেকে যায় না। তাহলে তো বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই ভজন করেন? ভজনের অধিকার কাদের? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন-

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। ৩০।।

অতি দুরাচারীও যদি অনন্যভাবে অর্থাৎ (অন্য + ন) আমাকে ছাড়া কোন অন্য বস্তু অথবা দেবতাকে ভজনা না করে কেবল আমারই নিরন্তর ভজনা করে, তাহলে তাকে সাধু বলে মনে করবে। যদিও এখন সে সাধন নয়, কিন্তু তার সাধু হওয়াতে কোন সন্দেহও নেই; কারণ সে এখন দৃঢ়ব্রত হয়েছে। অতএব ভজন আপনিও করতে পারেন, শর্ত কেবল এই যে, আপনি মানুষ হবেন। কারণ মানুষই দৃঢ়ব্রত হতে সক্ষম। গীতাশাস্ত্র পাপীদের উদ্ধার করে এবং সেই পথিক-

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।। ৩১।।

ভজনের প্রভাবে সেই দুরাচারীও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হন, পরমধর্ম পরমাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হন এবং সদা শাশ্বত পরমশান্তি লাভ করেন। কৌন্তেয় ! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না, তুমি নিশ্চিত জানবে। একটা জন্মে মুক্তিলাভ না হলে, পরের জন্মগুলিতে সেই সাধন সম্পূর্ণ করে শীঘ্রই পরমশান্তি লাভ করেন। অতএব সদাচারী, দুরাচারী ভজনের অধিকার সকলেরই। এতটাই নয়, বরং–

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।। ৩২।।

পার্থ ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র বা পাপযোনি যে কেউ হোক না কেন, তারা সকলেই আমাকে আশ্রয় করে পরমগতি লাভ করে। অতএব গীতাশাস্ত্র মানুষ মাত্রের জন্য, তা' সে যে কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হোক না কেন, বিশ্বের যে কোন স্থানে তার জন্ম হয়ে থাকুক না কেন, গীতা সকলের জন্য একসমান কল্যাণের উপদেশ দেয়। গীতাশাস্ত্র সার্বভৌম।

পাপযোনিঃ- অধ্যায় ১৬/৭-২১-এ আসুরীবৃত্তির লক্ষণগুলির অন্তর্গত ভগবান বলেছেন যে, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা সদম্ভে যজন করে, তারা নরগণের মধ্যে অধম। যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেও যজ্ঞের নাম দিয়ে

সদম্ভে যজন করে যারা, তারা ক্রূরকর্মা এবং পাপাচারী (পাপযোনি)। তারা পরমাত্মারূপ আমাকে দ্বেষ করে সেইজন্য পাপী। বৈশ্য এবং শূদ্র ভগবৎপথের স্তর-বিশেষ। স্ত্রীজাতির প্রতি কখনও সম্মান, কখনও হেয় দৃষ্টিতে দেখার মনোভাব সমাজে সদাই ছিল; কিন্তু যোগক্রিয়াতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সমান প্রবেশাধিকার।

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।। ৩৩।।

তাহলে ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি এবং ক্ষত্রিয় শ্রেণীর ভক্তগণের জন্য কি বলার থাকতে পারে? ব্রাহ্মণ হ'ল এক অবস্থা-বিশেষ, এই অবস্থা প্রাপ্ত সাধকের মধ্যে ব্রহ্মে স্থিত হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা পাওয়া যায়। শান্তি, আর্জব, অনুভবে উপলব্ধি, ধ্যান এবং ইষ্টের নির্দেশ অনুসারে চলবার ক্ষমতা যাঁর মধ্যে আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। রাজর্ষি ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঋদ্ধি-সিদ্ধির সঞ্চার, শৌর্য, প্রভুভাব, পশ্চাৎপদ না হওয়ার মনোভাব থাকে। এই স্তরের যোগী মুক্ত হয়ে যান, তাঁদের জন্য কিছু বলবার থাকে না। অতএব অর্জুন! তুমি সুখবিহীন, ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য দেহ ধারণ করেছ যখন, তখন আমারই ভজনা কর। এই নশ্বর দেহের প্রতি আসক্ত হয়ে সময় নষ্ট করো না।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এখানে চতুর্থবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের চর্চা করলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, ক্ষত্রিয়ের জন্য যুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্যাণের আর কোন পথ নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়স্কর। সংক্ষেপে চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে, চার বর্ণের সৃষ্টি আমি করেছি। তাহলে কি মানুষের বিভাগ চার জাতিতে করেছেন? বললেন- না, '**গুণকর্ম বিভাগশঃ**'-গুণের পরিমাপে কর্মকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে কর্ম হল একমাত্র যজ্ঞের প্রক্রিয়া। অতএব এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান যাঁরা করেন, তাঁরা চার প্রকারের হন। প্রবেশকালে এই যজ্ঞকর্তা শূদ্র, অল্পজ্ঞ হয়। এইপথে এগিয়ে কিছু ক্ষমতা লাভ হলে, আত্মিক সম্পত্তি কিছু-কিছু সংগ্রহ হয়, যখন, তখন এই যজ্ঞকর্তাই বৈশ্য শ্রেণীতে প্রবেশ করে। এই স্তর থেকে আরও উন্নত হলে প্রকৃতির তিনটি গুণকে সংযত করার ক্ষমতা সম্পন্ন হলে সেই সাধকই ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন এবং যখন এই সাধকের স্বভাবে ব্রহ্মানুভূতির যোগ্যতা লাভ হয়, তখন

সাধক ব্রাহ্মণ হন। শূদ্র ও বৈশ্য শ্রেণীর সাধকের থেকে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সাধকগণ ঈশ্বর-প্রাপ্তির অধিক সমীপে অবস্থান করেন। শূদ্র ও বৈশ্যও ব্রহ্মের অন্তর্ভূত হয়ে শান্ত হবে, তাহলে যাঁরা এর চেয়ে উঁচু অবস্থা লাভ করেছেন, তাঁদের জন্য কি বলা বাকী থাকে? তাঁরা তো লাভ করবেনই।

গীতা যে সমস্ত উপনিষদের সার-সর্বস্ব, সেগুলি ব্রহ্মবিদুষী মহিলাদের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তথাকথিত ধর্মভীরু, গোঁড়া ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়ণের অধিকার-অনাধিকারের ব্যবস্থা নিয়ে অনর্থক মস্তিষ্ক চালনায় ব্যস্ত থাকুক; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট বক্তব্য যে, যজ্ঞার্থ কর্মের নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতিতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার। অতএব তিনি ভজনা করবার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।। ৩৪।।

অর্জুন! মদগতচিত্ত হও। আমার অতিরিক্ত মনে যেন অন্য কোন ভাবের উদয় না হয়। আমার অনন্যভক্ত হও, অনবরত চিন্তনে প্রবৃত্ত থাক। শ্রদ্ধাপূর্বক নিরন্তর আমাকেই পূজা কর এবং আমাকেই নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হয়ে, আত্মা আমাতে একীভাবে স্থিত করলে আমাকেই লাভ করবে অর্থাৎ আমার সঙ্গে একত্ববোধ করবে।

নিষ্কর্ষ -

বর্তমান অধ্যায়ের আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন— অর্জুন! তোমার মত দোষমুক্ত ভক্তের জন্য আমি এই জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বলব, যা' জানবার পর কিছু জানা বাকী থাকবে না। এই সম্বন্ধে জেনে তুমি সংসার-বন্ধন থেতে মুক্ত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ বিদ্যার রাজা। বিদ্যা তাকেই বলে যা' পরব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ গোপনীয় বিষয়গুলির রাজা অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ ফলযুক্ত, সাধন-সুগম ও অবিনাশী। আপনি যদি অৎযল্প সাধনও করে থাকেন, তবু তা'কোন কালে নাশ হবে না, বরং এই সাধনের প্রভাবে আপনি পরমশ্রেয়পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন; কিন্তু একটা শর্তে, শ্রদ্ধাহীন পুরুষ পরমগতি লাভ না করে এই সংসার-চক্রে বিবর্তিত হয়।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যোগের ঐশ্বর্যের উপর আলোকপাত করলেন। দুঃখের সংযোগের বিয়োগকেই যোগ বলে অর্থাৎ সংসারের সংযোগ-বিয়োগ থেকে যা' সর্বথা মুক্ত, তার নামই যোগ। পরমতত্ত্ব পরমাত্মার মিলনের নাম যোগ। পরমাত্মার প্রাপ্তিই যোগের পরাকাষ্ঠা। যিনি এতে স্থিতিলাভ করেছেন, সেই যোগীর প্রভাব লক্ষ্য কর যে, সম্পূর্ণ ভূতগণের প্রভু এবং জীবধারীগণের পোষক হওয়া সত্ত্বেও আমার আত্মা ঐ ভূতগণে স্থিত নয়। আমি আত্মস্বরূপে স্থিত সেই পরমাত্মা আকাশে উৎপন্ন সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেরূপ আকাশে স্থিত হয়েও তাকে মলিন করতে পারে না, সেইরূপ সমস্তভূত আমাতে স্থিত কিন্তু আমি তাদের মধ্যে লিপ্ত নই।

অর্জুন! কল্পের আদিতে ভূতগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করি, সুসজ্জিত করি এবং কল্পের শেষে সমস্ত ভূত আমার প্রকৃতি অর্থাৎ যোগে আরূঢ় যে মহাপুরুষ, তাঁর অবস্থিতি, তাঁর অব্যক্তভাব লাভ করে। যদ্যপি মহাপুরুষ প্রকৃতির অতীত হন; কিন্তু প্রাপ্তির পরে স্বভাব অর্থাৎ স্বয়ং-এ স্থিত থেকে লোক-সংগ্রহের জন্য যে কাজ করেন, তাই হয় তাঁর স্থিতি। এই স্থিতির কার্যকলাপকে সেই মহাপুরুষের প্রকৃতি বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এক রচয়িতা আমি, যে সমস্ত ভূতকে কল্পের জন্য প্রেরণা প্রদান করি এবং আর এক রচয়িতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যে আমার ইঙ্গিত পেয়ে চরাচরসহিত ভূতগণকে সৃষ্টি করে। এও এক কল্প, যার মধ্যে দেহ-পরিবর্তন, স্বভাব-পরিবর্তন এবং কাল-পরিবর্তন নিহিত। গোস্বামী তুলসীদাসও তাই বলছেন—

এক দুষ্ট অতিসয় দুখ রূপা। যা বস জীব পরা ভবকূপা।।

(রামচরিতমানস, ৩/১৪/৫)

এই প্রকৃতির প্রভেদ দুটি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। এর মধ্যে অবিদ্যা অতিশয় দুষ্ট, দুঃখরূপ, যার দ্বারা বাধ্য হয়ে জীব ভবকূপে পড়ে আছে। যার প্রেরণাতে জীব কাল, কর্ম, স্বভাব এবং গুণের চক্রে জড়িয়ে যায়। অন্যটি-বিদ্যামায়া, যার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমি সৃষ্টি করি। গোস্বামীজীর অনুসারে প্রভু সৃষ্টি করেন—

এক রচই জগ গুণ বস জাকে। প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকে।।

(রামচরতিমানস, ৩/১৪/৬)

এটি জগতের রচনা করে, গুণ যার আশ্রিত। কল্যাণকর গুণ একমাত্র ঈশ্বরে বিদ্যমান। প্রকৃতির কোন গুণই নেই, তা' নশ্বর; কিন্তু বিদ্যাতে প্রভুই প্রেরকরূপে কর্ম করেন।

এইরূপ কল্প দুই প্রকার। বস্তু, দেহ এবং কালের পরিবর্তন এক প্রকারের কল্প; কিন্তু এই যে পরিবর্তন তা' প্রকৃতি আমার ইঙ্গিত পেয়ে করে; কিন্তু এর থেকে শ্রেষ্ঠ কল্প, যা' আত্মাকে নির্মলরূপ প্রদান করে, তার বিন্যাস মহাপুরুষ করেন। তাঁরা অচেতন ভূতগণকে সচেতন করেন। ভজনের আদিই এই কল্পের আরম্ভ এবং ভজনের পরাকাষ্ঠা হল কল্পের শেষ। যখন এই কল্প ভবরোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরোগ করে শাশ্বত ব্রহ্মে স্থিতি প্রদান করে, সেই স্থিতি অবস্থা লাভের সময় যোগী আমার অবস্থিতি এবং আমার স্বরূপ লাভ করেন। প্রাপ্তির পরে মহাপুরুষের অবস্থিতিকেই তাঁর প্রকৃতি বলে।

ধর্মগ্রন্থগুলি গল্পের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চারটি যুগ সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই কল্প সম্পূর্ণ হয়, মহাপ্রলয় হয়। প্রায়ই লোকে এর যথার্থ সম্বন্ধে বুঝতে পারে না। যুগের তাৎপর্য হল দুই। যতক্ষণ আপনি পৃথক্, আরাধ্য পৃথক্, ততক্ষণ যুগধর্ম থাকবে। গোস্বামীজী রামচরিতমানসের উত্তরকাণ্ডে এই বিষয়ে চর্চা করেছেন। যখন তামসিক গুণ কাজ করে, রাজসিক গুণ অল্প মাত্রাতে থাকে, চারিদিকে শত্রুতা এবং বিরোধভাব দেখা দেয়, এইরূপ ব্যক্তি কলিযুগীয় হয়। সে ভজনে অক্ষম হয়; কিন্তু সাধনা আরম্ভ হলে যুগের পরিবর্তন হয়। রাজসিক গুণের বৃদ্ধি হয়, তামসিক গুণ ক্ষীণ হয়ে আসে, স্বভাবে সামান্য সাত্ত্বিক গুণও চলে আসে, হর্ষ এবং ভয়ের দ্বিধা অন্তর্মনে চলতে থাকে তখন সেই সাধক দ্বাপর যুগের অবস্থা লাভ করে। ক্রমশঃ সাত্ত্বিক গুণের বাহুল্য হলে, রজোগুণ স্বল্পমাত্রায় থাকে, আরাধনা কর্মে আসক্তি হয়, ত্যাগের ক্ষমতা লাভ করে ত্রেতা যুগে এইরূপ সাধক বহু যজ্ঞ করেন। **'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'**- যে জপ যজ্ঞের শ্রেণীতে পড়ে সেই জপ, যার ওঠা-মানা শ্বাস-প্রশ্বাসে (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে), তার অনুষ্ঠান করবার ক্ষমতা লাভ হয়। যখন শুধু সত্ত্বগুণ বাকী থাকে, বৈষম্যের ভাব বিলুপ্ত হয়, সমতা লাভ হয়, এটাই কৃতযুগ অর্থাৎ কৃতার্থ যুগ অথবা সত্যযুগের প্রভাব। সেই সময় প্রত্যেক যোগী বিজ্ঞানী হন, ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে জানার যোগ্য হন, স্বাভাবিকভাবে ধ্যানমগ্ন হওয়ার ক্ষমতা তাঁরা লাভ করেন।

বিবেকীগণ মনের মধ্যে যে যুগধর্মের উত্থান-পতন হয় তা বুঝতে পারেন। মনকে নিরুদ্ধ করবার জন্য অধর্মকে পরিত্যাগ করে ধর্মে প্রবৃত্ত হন। যখন নিরুদ্ধ মনের বিলয় হয় তখন যুগের সঙ্গে কল্পও শেষ হয়ে যায়। পূর্ণত্বে স্থিতি প্রদান করে কল্পও শান্ত হয়ে যায়। একেই প্রলয় বলে, যখন প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয়। এর পর মহাপুরুষের যা অবস্থিতি, তাই তাঁর প্রকৃতি তাঁর স্বভাব।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- অর্জুন ! মূঢ় ব্যক্তি আমাকে জানে না, ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আমাকে তুচ্ছ বলে মনে করে, সাধারণ মানুষ ভাবে। প্রত্যেক মহাপুরুষের সঙ্গে এই বিড়ম্বনা হয়, তৎকালীন সমাজ তাঁদের উপেক্ষা করে। তীব্রভাবে তাঁদের বিরোধ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণও এর অপবাদ ছিলেন না। তিনি বলছেন যে, আমি পরমভাব-এ স্থিত; কিন্তু শরীর আমার মানুষেরই, সেইজন্য মূঢ়গণ আমাকে তুচ্ছ বলে, মানুষ বলে সম্বোধন করে। এইরূপ ব্যক্তিগণের আশা, কর্ম, জ্ঞান সব ব্যর্থ। এইরূপ ব্যক্তিগণ যা খুশি তাই বলে, যে কোন কাজ করে বলে আমরা কামনা করি না, এইরূপ বললেই যেন নিষ্কাম কর্মযোগী হওয়া যায়। সেই আসুরিক স্বভাব ব্যক্তিগণ আমাকে পরখ করতে পারে না; কিন্তু দৈবী সম্পদ্ যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরা অনন্যভাবে আমার ধ্যান করেন। নিরন্তর আমার গুণের চিন্তন করেন।

অনন্য উপাসনা অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্মের মার্গ দুটি। প্রথমটি জ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ নিজের উপর নির্ভর করে, নিজের সামর্থ্য বুঝে সেই নিয়ত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অন্যটি প্রভু-সেবক ভাবের, যার মধ্যে সদ্গুরুর প্রতি সমর্পিত হয়ে সেই কর্মই করা হয়। এই দুটি দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে লোকে আমার উপাসনা করে; কিন্তু তাদের দ্বারা যতটুকু কর্ম সম্ভব হয় সেই যজ্ঞ, আহুতি, কর্তা, শ্রদ্ধা এবং ঔষধি-যেগুলির দ্বারা ভবরোগের চিকিৎসা হয়, তা আমি। শেষে যে গতিলাভ হয়, সেই গতিও আমি।

এই যজ্ঞকেই লোকে '**ত্রৈবিদ্যাঃ**'- প্রার্থনা, যজন অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সমত্ব প্রদানকারী বিধিগুলির মাধ্যমে সম্পাদন করেন; কিন্তু পরিবর্তে স্বর্গের কামনা করেন, আমি তা' প্রদানও করি। তার প্রভাবে তাঁরা ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত করেন, দীর্ঘকাল ধরে উপভোগ করেন; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হলে তাঁদের পুনর্জন্ম হয়। সেইজন্য ভোগের কামনা করা উচিত নয়। যিনি অনন্যভাবে অর্থাৎ 'আমি ছাড়া অন্য কেউ নেই', এরূপভাব নিয়ে নিরন্তর আমার চিন্তন করেন, লেশমাত্রও ত্রুটি না রেখে ভজনা করেন, তাঁর যোগের সুরক্ষার দায়িত্ব আমি নিজ হাতে তুলে নিই।

এর পরেও কিছু লোক অন্যান্য দেবতার পূজা করে। তারা আমারই পূজা করে; কিন্তু আমার প্রাপ্তির বিধি তা নয়। সম্পূর্ণ যজ্ঞের ভোক্তা যে আমি এটা তারা জানে না অর্থাৎ তারা পূজার পরিণামে আমাকে লাভ করে না, সেইজন্য তাদের পতন হয়। তারা দেবতা, ভূত অথবা পিতৃগণের কল্পিতরূপে নিবাস করে; কিন্তু আমার ভক্ত আমার মধ্যে নিবাস করে, আমার স্বরূপলাভ করে।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞার্থ কর্মকে অতি সহজ বলছেন, তিনি বলছেন, ফল, ফুল অথবা যা' কিছু শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে অর্পণ করা হয়, তা আমি গ্রহণ করি। অতএব অর্জুন! তুমি সমস্ত আরাধনা আমাকে সমর্পণ কর। যখন সর্বস্বের ন্যাস হবে, তখন তুমি যোগযুক্ত হয়ে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং সেই মুক্তি ও আমার স্বরূপ এক।

বিশ্বের সমস্ত প্রাণী আমার, কোন প্রাণীর প্রতি আমার প্রীতি বা দ্বেষভাব নেই। আমি তটস্থ থাকি; কিন্তু যিনি আমার অনন্য ভক্ত, আমি তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি আমার মধ্যে স্থিত। অত্যন্ত দুরাচারী, জঘন্যতম পাপীও যদি অনন্যভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে ভজনা করে, তাহলে সে সাধু মান্য করার যোগ্য। যদি সে দৃঢ়নিশ্চয় হয়, তাহলে সে শীঘ্রই পরম-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং সদা শাশ্বত পরমশান্তি লাভ করে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করলেন যে, ধার্মিক কে? এই সৃষ্টির অন্তর্ভূত যে কোন প্রাণী যদি অনন্যভাবে এক পরমাত্মার ভজনা করে, তাঁর চিন্তন করে, তাহলে সে শীঘ্রই ধার্মিক হয়ে যায়। অতএব সেই ব্যক্তি ধার্মিক, যে একমাত্র পরমাত্মার স্মরণ করে। অবশেষে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, অর্জুন! আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না। শূদ্র, নীচ, আদিবাসী, অনাদিবাসী যে কোন নামধারী, পুরুষ অথবা স্ত্রী, পাপযোনি, তির্যক্‌যোনি সকলেই আমার শরণাগত হয়ে পরমশ্রেয় লাভ করে। সেইজন্য অর্জুন! সুখরহিত, ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু দুর্লভ মনুষ্য দেহ ধারণ করেছ যখন, তখন আমার ভজনা কর। তাহলে ব্রহ্মে স্থিতি প্রদানকারী যোগ্যতাগুলির সঙ্গে যিনি যুক্ত, সেই ব্রাহ্মণ এবং যিনি রাজর্ষিত্বের স্তর থেকে ভজনা করেন, এইরূপ যোগীর জন্য কি বলার থাকতে পারে? তাঁরা তো প্রকৃতির দ্বন্দ্বের অতীত। অতএব অর্জুন! নিরন্তর আমাতেই মনকে যুক্ত কর, নিরন্তর নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হয়ে তুমি আমাকেই লাভ করবে। যেখান থেকে ফিরে আসতে হয় না।

প্রস্তুত অধ্যায়ে সেই বিদ্যার উপর আলোকপাত করেছেন যা' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জাগ্রত করেন। এটি রাজবিদ্যা একবার জাগ্রত হলে নিশ্চিতরূপে কল্যাণ করে। অতএব—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসম্বাদে 'রাজবিদ্যাজাগৃতি' নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'রাজবিদ্যা জাগৃতি' নাম নবম অধ্যায় পূর্ণ হ'ল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'রাজবিদ্যাজাগৃতি' নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।। ৯।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'রাজবিদ্যা জাগৃতি' নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।